সূচীপত্র :

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কবিতা : Bengali M.A. 2nd Semester [Jan, 2020 to June, 2020]-এর ছাত্রছাত্রীদের জন্য।

Scanned with CamScanner

'হাট' কবিতার শুরুতেই আমরা দেখতে পেলাম : 'দূরে দূরে গ্রাম দশ-বারোখানি / মাঝে একখানি হাট'। এই হাট দিনের বেলায় নানা প্রান্ত থেকে আগত ক্রেতা বিক্রেতাদের সমাগমে বেশ জমজমাট। শোনা যায়, নানা কোলাহল। দেখা যায়, চেনা-অচেনার ভিড়। কবি যতীন্দ্রনাথ আরও সচেতন ভাবে লক্ষ্য করেছেন :

মেলে চেনাচিনি, দর জানাজানি
কানাকড়ি নিয়ে কত টানাটানি
হানাহানি করে কেউ নিল ভরে
কেউ গেল খালি ফিরে।

কিন্তু কবিতার শুরু থেকেই কবির দৃষ্টিকোণের বা দৃষ্টিভঙ্গীর একটি বিশেষ প্রবণতা সবিশেষ লক্ষণীয়। কবি লক্ষ করেছেন:

এক. সন্ধ্যায় সেথা জ্বলে না প্রদীপ / প্রভাতে পড়ে না ঝাঁট।

দুই. দূরে দূরে গ্রামে জ্বলে ওঠে দীপ / আঁধারেতে থাকে হাট।

তিন. নির্জন হাটে রাত্রি নামিল / একক কাকের ডাকে

কবির সচেতন বক্তব্য এই নানা বর্ণের, নানা রঙ্গের, মানুষ নিজেদের প্রয়োজনে হাটে আসে। একেক সময় তাদের সংখ্যাটা এতটাই বেশি যে, 'হিসাব নাহিরে- এল আর গেল / কত ক্রেতা বিক্রেতা'

Scanned with CamScanner

কিন্তু অবস্থা ছিলেন গড়িয়ে সন্ধ্যে, সন্ধ্যে পেরিয়ে যখন রাত্রি নেমে আসে তখন হাটের কথা কোনো মানুষেরই মনে থাকেনা তাই প্রভাতেও কোনো মানুষ হাটকে ভালো বেসে ঝাঁট দিতে আসে না। রাতের বেলা কেউ হাটে একটাও প্রদীপ জ্বালে না। বিকালে দোকানের ঝাঁপ বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাটকে আর মানুষ সঙ্গ দেয় না। হাটে তখন ~~[illegible]~~ দেখা যায় 'শ্রেণি হারা একা ক্লান্ত কাকের পাখার' হাত ধরে নিশা বা রাত্রিকে নেমে আসতে। হাটের উপর দিয়ে বয়ে চলে নদীর বাতাসের ছাড়া প্রশ্বাস। এরপর কবি যতীন্দ্রনাথ বললেন:

নূতন করিয়া বসা আর ভাঙা
পুরানো হাটের মেলা
দিবস রাত্রি নূতন যাত্রী
নিত্য নাটের খেলা।

বোঝাই যাচ্ছে, 'নিত্য নাটের খেলা' বলতে যতীন্দ্রনাথ হাটকে কেন্দ্র করে মানুষের জীবনের কথা বলছেন। - ~~[illegible]~~ মরণশীল মানুষের জীবন যেন এই হাটের মতনই শুরু হয়। একটা সময় পর্যন্ত চলে এই জীবনের আনাগোনা। হাটের পর্ব যেমন শেষ হয়, মানুষের জীবনও তেমনই শেষ হয় একসময়। - হাটের বুকে যেমন বিকেল হয় ও দোকানপাট বন্ধ হয় ঠিক তেমনই মানুষের জীবনেও বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আঁধার নেমে আসে। মানুষ ক্রমশ: একা বা নিঃসঙ্গ হতে আরম্ভ করে। এইভাবে চলতে থাকে ভাঙা গড়ার খেলা অর্থাৎ জন্ম মৃত্যুর খেলা। কবিতা শেষ করছেন যতীন্দ্রনাথ এই বলে,

'উদার আকাশে মুক্ত বাতাসে
চিরকাল একই খেলা'

'নবনিদাঘ' কবিতায় কবিতায় কবি যতীন্দ্রনাথ নিজের মনকে সব কাজ শেষ করে খেলার আদেশ দিয়েছেন। আর ~~[illegible]~~ মনকে বলেছেন:

Scanned with CamScan

ছড়ায়ে যে মোর শিথিল শরীর
শুধু আঁচলের প্রায়
চেয়ে থাকে দূরে, অর্ধ শয়নে
আধখোলা জানালায়।

আধখোলা জানালা দিয়ে কবি তাকালেন বাইরের দিকে। বাইরের প্রকৃতিতে তখন 'দুপুর বেলার রূপালি রৌদ্র' বিরাজমান। গাছে গাছে ধরেছে ফুল। সেই ফুলের দল ফুলের ভারে নুয়ে পড়েছে। সেইসব ফুলকে ঘিরে গুঞ্জন করে চলেছে মৌমাছি। কিন্তু কবি যতীন্দ্রনাথের মন স্থির হয়ে সে সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারলো না। ফুলের গন্ধ ফুলের উপর যেমন যেন 'ঘুমোয় কাঁদিয়া আছে' বলে কবির মনে হল। কবির মন সেই স্থান হতে উড়ে গেল। কোথায়? কবির ভাষায়:

দূরে বালুচরে কাঁপিছে রৌদ্র / ঝিঁঝির পাখার মত /
অগ্নিকুণ্ড জ্বালি কে হাপরে ফুঁ দিতেছে অবিরত।

বোঝাই যাচ্ছে, এমন কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই পরিবেশটা একেবারেই পালটে গেলো। দুপুর বেলার রূপালি রৌদ্র আর রইল না। এই রোদ পালটে গেল কামারশালের হাপরের চুল্লীর মতন। সেখানে পথিক ভাবকে কবির মনে হয় কামার যেন তার 'হাতুড়ি ঠুকিছে তালে'। - গোটা পরিবেশটা যেন মরুভূমিতে পরিণত হয়ে গেলো অচিরেই। প্রসঙ্গত এসেছে মরীচিকার অনুষঙ্গ। কবি বলছেন:

মরীচিকা নহি শুধু পথিক / ফুকারে ফটিক জল।

নিজের দিকে তাকিয়েও কবি একটি উপলব্ধি করলেন। আধখোলা জানালা দিয়ে দুপুর বেলাকার রূপালি রোদ্দুর দেখতে দেখতে কবির মন মানসিকতা একেবারেই পালটে গেছে। কবির বাসনা আর পাঁচ জনের থেকে একেবারেই আলাদা। বাসনা যেন 'মরীচিকা হয়ে আঁকা পড়ে দূর পথে'। অর্থাৎ মরীচিকা যেমন ক্রমশই দূরের থেকে দূরে সরে যায়, ঠিক তেমনই কবির বাসনাও তাঁর ছোঁওয়ার বাইরের এক বস্তু।

'নবজাতক' কাব্যের প্রকাশ ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে। কবি রবীন্দ্রনাথ এখানেও দুঃখকে বরণ করে নিয়েছেন। মৃত্যু দিনও দেখেছেন। 'লোহার ব্যথা' হয়েছে কবিতার নাম। কবি নিজে এখানে লোহার সঙ্গে উপস্থিত। কবিতায় কামারকে উদ্দেশ্য করে কবি বলছেন 'ও ভাই কর্মকার - / আমারে পুড়িয়ে পিটিয়ে ছাড়া কি সাধিছ কর্ম্ম আর?' - কামারের লোহাকে পোড়ানো আর পেটানো এখানে দুঃখভোগের সঙ্গে উপস্থিত। - সেই কোন ভোর থেকে হাতুড়ির ঘা সহ্য করে চলেছে বেচারি লোহা। গভীর রাত্রি পর্যন্ত এই অসহনীয় যন্ত্রণা থেকে তার মুক্তি নেই। যন্ত্রণা সহ্য করতে করতে সেই লোহা দেখছে:

সেখানে হেথায় হাপর হাঁপায়, হাতুড়ি মাগিছে ছুটি
মুক্ত নিশ্বাস, কখনো শিথিল তোমার বজ্রমুঠি।

কবিতায় কবির যন্ত্রণাভোগের নানান চিত্র এঁকেছেন কবি। রাত দুপুরে কবি মনে করতে পারছেন না, ভেবেছিলো তার চেহারা কেমন ছিল। কতো তাকে ধরে ধরে ভাঙা হয়েছে। ভাঙার পর গড়া হয়েছে পেরেক ঠোকা নানা বিকৃত আকার দেওয়া হয়েছে। কখনো কালো হয়েছে আগুনে, কখনো লাল আবার কখনো বা রক্তিম উজ্জ্বল। - এইসব চিত্রগুলিই কবির কাছে অন্যায়, যন্ত্রণা, দুঃখভোগের নানা রূপ। কিন্তু কবি কোনো অবস্থাতেই নিজের চৈতন্য হারিয়ে ফেলেন নি। সদর্পে বলেছেন: 'যাহা অন্যায় হোক না প্রবল করিয়াছি প্রবল করিয়াছি প্রতিবাদ।'

কবিতার শেষদিকে কবি অত্যন্ত সচেতনভাবে একটি প্রশ্নও করেছেন কর্মকারকে। কবি বলছেন:

হে গো বন্ধু এই কানে কানে, আপনার প্রাণে তুমি
আমি না থাকিলে মারা যেত কিনা তোমার দিনের তুমি ?

এত অত্যাচার সহ্য করেও লোহা যেমন মানুষকে বন্ধু বলছে তেমন করেই সে কবি দুঃখ, যন্ত্রণা, অভাবকে বন্ধু হিসেবে মনে করে দিন কাটিয়েছেন লোহার মতন সহনশীল জীবনের কথা। এই ~~জীবনে~~ জীবন দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়েছে দুঃখ সহ্য করার মধ্য দিয়ে, তবুও জীবন তার প্রতিবাদী চরিত্র হারিয়ে ফেলেনি। - এইদিকটিও বিশেষ লক্ষণীয়।

'মরুমায়া' কাব্যের প্রকাশ ১৩৩৭ বঙ্গাব্দে। কবি যতীন্দ্রনাথের দুঃখবাদী কবিমানসের ছবি দেখা ~~যায়~~ যাচ্ছে এখানেও। এই কাব্যের 'হাট' কবিতায় কবি বলছেন:

মাঠের যেমন বুকের কাঁদন
হাটে যে মিলিল, - ভাই
হাটে হাটে আমি ঘুরে ফিরি বৃথা
হাট করিনে ভাই।

'হাট করা' শব্দের অর্থ হাটে বাজার করা। আগের কবিতায় হাট থেকে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সংগ্রহ করতেই বহু মানুষ হাটে এসেছিল। এখানে কবি কোন প্রয়োজনে হাটে আসেন নি। হাটে এসেছেন কবি তাঁর স্বতন্ত্র একটি মানসিকতা নিয়ে। কবি বলছেন:

হাটের বক্ষে দেখে যাই আমি
কত যে কাঁদছে মাঠ।

কবি বলছেন, মাঠেই ফসল হয়। চাষী যখন সেই ফসল তুলে নেয় তখন মাঠের অন্তর সন্তানহারা মায়ের মতনই কাঁদতে থাকে।

কত যে মাঠের আঁচলের ধনে
ভরা এ হাটের ডালা
কত যে মাঠের ছিন্ন কুসুমে
হাটের গলার মালা।

হাটে যেখানে সবজি বিক্রি হয়, সেখানে এসে কবি দেখতে পান

সবজি বাজারে আসিয়া দেখি যে
পড়িয়া হাটের ফাঁদে
ফলে ফুলে পাতে শীতের প্রভাতে
মাঠের শিশির কাঁদে।

Scanned with CamScan

মাঠে ফসল ধরে আছে। কবি সেই ফসল সমেত মাঠের সৌন্দর্য দেখতে পেন। ফসলকে মাঠ থেকে আলাদা করে নেওয়ার যন্ত্রণাকে কেন্দ্র করে যে দুঃখ সেই দুঃখের কথাই বলতে চেয়েছেন দুঃখবাদী কবি যতীন্দ্রনাথ।

'ছাতার কথা' কবিতায় কবি তাঁর বন্ধুকে শুনিয়েছেন কেমন করে তিনি 'ভাঙা নৌকায় হারানু ছাতাটি ভাদুরে গাঙের জলে' - সেই কাহিনি। কবি বলছেন, সেই নৌকাটি ছিল ছিদ্রবিহীন। ভাঙা এবং 'উপরে ও নীচে জল'। সেইরকম একটি নৌকার 'এককোণে ঠেসে কবি বসেছিলেন ছাতাটি মাথায় দিয়ে।- প্রকৃতিতে তখন 'আকাশে ছুটিছে বাদলের ঝাঁক, ধেয়ে আসিছে রাতি,'। এমনসময়, 'আচমকা এক দমকা হাওয়ায় উড়াইয়ে নিল ছাতি।' কবির চোখের সামনে কবির সে প্রিয় ছাতা নদীর জলে ডুবে গেল। তখন কবি নিজের অবস্থা সম্পর্কে বলছেন:

ভাবি নিজ বোকামি
নিরুপায় হয়ে বসিয়া বসিয়া দেখিলাম ছাতাডুবি।

ছাতাকে কেন্দ্র করে কবির অসহায় উপলব্ধি:

নায়ের তলায় ঢেউয়ের বসতি, ঢেউয়ের তলায় জল
কে জানে কোথায় ছাতার বসতি সেই অতলের তল।
পেটের উপর বুকের বসতি, বুকের উপর মাথা
তাহারও উপর সুখের বসতি, মাথার উপর ছাতা।

এমন একটি ছাতাকে কবি 'বোকামি' করে হারিয়ে ফেললেন। তার যে এখন দুঃখের শেষ নেই। কবি বলছেন:

রোদে আর জলে, ঝড়ে কি বাদলে, সমান সাথের সাথী
অজানা নদীতে উজানি চলিতে খোয়ালাম হেন ছাতি!
হোক শত তালি, ছিল সে মাথালি মাথার দুখের দুখী
আজ তারে ফেলে, লগি ঠেলে ঠেলে হইলাম ভবঘুরী।

Scanned with CamScanner

হারিয়ে যাওয়া ছাতাটি কবির কাছে ক্রমশ হয়ে উঠেছে সুখের প্রতীক। - হারিয়ে যাওয়া ছাতাটির গায়ে ছিল শত তালি দেওয়া।- তালিগুলিকে কবি মনে করেছেন, নানান দুঃখ দিয়ে এই তালি দেওয়া হয়েছিল।- কিন্তু তা সত্ত্বেও ছাতাটি মনের থেকে কবি মনে এনে দিত সুখ। সুখের অনুভূতি। কবিতার শেষে কবি তাই তাঁর বন্ধুকে জানিয়েছেন, বাকি বর্ষাটা তিনি ভিজে ভিজেই কাটিয়ে দেবেন। নতুন ছাতা কেনার কোনো ইচ্ছেই তাঁর নেই।

নূতন ছাতার সাধ নাই ভাই, প্রতিজ্ঞা করেছি যে,-
এবারের মত বাকি বর্ষাটা কাটাইব ভিজে ভিজে
বন্ধু, বন্ধু, ভুলায়োনা দিয়ে নূতন সুখের প্রীতি
নানান দুখের তালি দেওয়া এই হারানো সুখের স্মৃতি।

কবি সত্যিই দুঃখবাদী। দুঃখকে তিনি মনের ভেতরে সযত্নে লালন করেন। বাঁচিয়ে রাখেন। মরীচিকা (১৩৩০) থেকে মরুমায়া (১৩৩৭) পর্যন্ত কাব্যগুলিতে কবি তাঁর রচিত এই দুঃখবাদকে নানাভাবে নানাভাষায় প্রকাশক করে নিজের কবিমানসের স্বরূপকে স্পষ্ট করেছেন। কবি কোনোকিছুর মধ্যেই সুন্দরকে দেখতে পান না। পান নি। এজন্য কবি নিজেকে একান্তই 'অভাগা' মনে করেন। কবি তাই বলেছেন:

দুরন্ত মন মানে না শাসন, দুঃশাসনের মত
রহস্যময়ী প্রকৃতির ঐ বসন টানিতে রত।

দেখাই যাচ্ছে, কথাগুলির মধ্যে মহাভারতের প্রসঙ্গ এসেছে। কবি যেন দুঃশাসনের মতো দ্রৌপদীরূপী প্রকৃতির বসন টেনে নিয়ে প্রকৃতির আবরণ প্রকাশ করে দিতে উদ্যত। তাই কবি অত্যন্ত সচেতনভাবেই বলেছেন:

Scanned with CamScanner

যত টানি তার ~~রূপ~~ বাস –
জীবনাঙ্গনে পুড়িয়া উঠে বৃথা মিথ্যার বাশ।' [মরুমায়া: দুখ]

যতীন্দ্রনাথের 'সায়ম' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হল ১৩৪৮ বঙ্গাব্দে। খ্রিস্টাব্দের বিচারে সময়টা তখন ১৯৪১। এই কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলিকে একটু সূক্ষ্মভাবে, সচেতনভাবে পড়ে দেখলে বোঝা যায় কবি এখানে তাঁর সেই দুঃখবাদী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে অনেকটা দূরে সরে এসেছেন। কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা 'পারুলের আহ্বান'। – এখানে সাত ভাই চম্পার একমাত্র বোন পারুল তার ভাইদের জেগে উঠার জন্য আহ্বান করছে। কবিতায় এগারোটি স্তবকের প্রত্যেকটির শেষে পারুলের একান্ত আন্তরিক আহ্বান: 'জাগো মোর সাত ভাই জা-গো –!' সংকেত এখানে কবি নিজেই যেন নতুন মন-মানসিকতায় নতুনভাবে জেগে উঠেছেন। যে কবি প্রেমকে অনেকটাই দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন, সেই কবিই এই কাব্যের 'প্রেম' কবিতায় স্বতঃস্ফূর্ত ভঙ্গীতে বলছেন:

আজি নিশিশেষে বসে মুখোমুখি
নব পরিচয় দুজনে লব।
নূতন করিয়া গুণ্ঠন তুলি
মিলাব নয়ন নয়নে তব।

শুধু কবিতার বক্তব্যেই নয়। কবিতার নামেও এখানে অভিনবত্ব দেখালেন কবি। বন্ধু যতীন্দ্রমোহন বাগচীর উদ্দেশ্যে কবি যতীন্দ্রনাথ লিখলেন নতুন কবিতা: 'বন্ধুর অভিনন্দন দিনে।' কবি বলছেন:

এসেছি বন্ধু মাথায় বহিয়া আকাশের মেঘভার
যার বুকে তুমি সাতরঙা বহু ইন্দ্রধনু গড় তার
এসেছি বন্ধু, দুপায়ে দলিয়া ঝরা বকুলের রাশ
যে বকুল আজও তোমার গানের যোগায় ~~বী~~ নিঃশ্বাস।

কবিতার একেবারে শেষেই কবি যতীন্দ্রনাথ সচেতনভাবেই বললেন:

তাদের পক্ষে তোমারে, হে কবি, দিনু অভিনন্দন,
সুন্দর যেন তোমারি ছন্দে তুলে তার ক্রন্দন।

এক সময় কবিতায় যারা সুন্দরকে জয়গান করে তাদের উদ্দেশ্যে ব্যঙ্গ করেছেন। ~~ওরা~~ 'সায়ম্'-এ এসে কবি নিজে থেকেই সেই ধরনের, সৌন্দর্যের জয়গানকারী কবিকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন।

'রবিপ্রণাম' কবিতাতে কবি যেন নতুনভাবে, নতুনভাবনায় সূর্যদেবকে আপন প্রীতি জানিয়েছেন। কবিতায় দিবাকরের প্রতি কবির অনুভূতি: জয়তু অরুণচ্ছবি / জয়তু প্রসন্ন রবি
প্রকৃতির রবি থেকে আস্তে আস্তে কবি 'রবি'র যথার্থস্বরূপটি আমাদের কাছে স্পষ্ট করছেন। — কবি বলছেন:

যে রবি পশ্চিমে ডুবে
নিত্য পুনঃ উঠে পূবে
আমাদের সে রবি যে নয়

তাহলে আমাদের রবি কে? কবি বলছেন:
'জয়তু প্রসন্ন রবি / পাষাণ প্রাণের ~~রবি~~ কবি'।
এই কবির যথার্থ স্বরূপ সম্পর্কে কবি যতীন্দ্রনাথ বলছেন:

জানি বন্ধু জানি জানি
তোমার কণ্ঠের বাণী
বিশ্বজনে রেখেছে ভুলায়ে

স্পষ্টতই এ রবি হলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ।

শাওনিয়া (একতারার গান) কবিতাতেও প্রকৃতির জয়গান করেছেন কবি। 'থৈ থৈ শাওন এল ওই' লাইনটি এখানে ধ্রুবপদ হয়ে পুনরাবৃত্ত হয়েছে একাধিকবার। কবি একতারাবাহী বৈরাগীকে আহ্বান করেছেন শাওন আসার আনন্দে

Scanned with CamScanner

সামিল হবার জন্য। বলছেন: পথহারা চৈতালীর ভোর / রক্তাভাসী কই? - আবার কখনো বা চৈতালীকে প্রশ্নের সুরে বলেছেন:

চৈতালীতোর অশ্রু দেখে বাদল মনোমর
বকুল-যূথির ফুল বাদলে
ভিজল কি অন্তর?

কবিতার শেষে চৈতালীর উদ্দেশ্যে কবির বক্তব্য:

তারছেঁড়া রক্তাভার মায়া
আর কেন বা হায়
চৈতালী কোন ভ্রমর শাওন
ভাসিয়ে যে না যায়!

বোঝাই যায়, কবিতা জুড়ে কবির মন-কাজ করছে 'শাওন ঘি ঘি শাওন ঝুল উই' নামক আনন্দময় সংগীতটি। কবি সেই আনন্দে চৈতালীকেও ভাসিয়ে দিতে চেয়েছেন।